রত্নেশ্বর কার্জির জমিজিরেত

নকুল মণ্ডল

এক

পুকুরপাড় থেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে রাস্তায় উঠতে পরিমল নাথের সামনে পড়লেন রত্নেশ্বর কার্জি। নতুন কেনা সাইকেল থেকে একটা পা মাটিতে রেখে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে পরিমল নাথ। তাঁকে দেখে বড় মুখটা ভার হয়ে গেল রত্নেশ্বর কার্জির।

আজ একটা শুভ দিন। তাঁর বড় মেয়েকে দেখতে আসবে। পাত্রপক্ষ রামপুরহাটের। এমন দিনে ভোরে অলক্ষুণে কাউকে তিনি দেখতে চাননি। বিশেষত পরিমল নাথের মত লোক তো নয়ই। এই লোকটা যাকে বলে শনির বড় ভাই। যেদিকে তাঁর ছায়া পড়ে, একটা না একটা কিছু ঘটবেই

পরিমল নাথের প্রতি বিরাগ তাঁর একার নয়। লোকটার টাকার জোর আছে বলে সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না। বরং সমীহই করে আড়ালে দেয় গালাগালি। রত্নেশ্বর কার্জির এতটা বাড়াবাড়ি নেই। তবে তিনিও যে তাঁকে অপছন্দই করেন, এটা সত্যি। কিন্তু এখন সামনে পড়ায় কুশল বিনিময় না করা অশোভন দেখায়।

কিন্তু, পরিমল নাথ দেখছেন কী? এখানে দ্রষ্টব্য কিছু নেই। রাস্তা ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে বিঘের পর বিঘে ধানি জমি। ধান কাটা শেষ হবার পর গোড়াগুলি ছুঁচলো হয়ে আছে। একটু দূরে কাঠের প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একটা বাঁশঝাড় পাশে খানিকটা পতিত জমি। উভয়ই গজু বুড়ার। তিনি মাস দুই আগে গত হয়েছেন। বাঁশঝাড় সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে পোড়ানো হয়েছে তাঁকে। এখন ঝাড় সহ জমির মালিক তাঁর ছেলেরা।

এই ঝাড়ে বাঁশ যে খুব ভাল, তা নয়। বরং পাতলা এবং আকারে বামন বামন। অযত্ন এবং অবহেলায় পড়ে থাকে। ঝাড়টা লোকালয় থেকে দূরে বলে সেখান প্রাকৃতিক কাজের জন্যও কেউ যায় না। অবশ্য ভাটিয়াদের বেশিরভাগই বাড়িতে পায়খানা বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কথা আলাদা।

মাঝেমধ্যে টাকার প্রয়োজন পড়লে গজু বুড়ার ছেলেরা বাঁশ বেচে। জ্বালানিতে টান পড়লে মেয়ে-বৌরা তিন-চারজন মিলে ঝাড়ে যায়। বাঁশের গুঁড়ি তোলে। কঞ্চি, শুকিয়ে যাওয়া বাঁশ সংগ্রহ করে। গজু বুড়াকে ওখানে পোড়ানর পর একটা কমেছে। ভূতের ভয়ে পারতপক্ষে মেয়েরা ও'পথ মাড়ায় না। গ্রামদেশে ভূত-প্রেতের খুব উৎপাত। ভয়টা স্বাভাবিক।

পরিমল নাথ আপনমনে গজু বুড়ার ওই ঝাড়ের দিকে যেন চোখ রেখেছেন। লোকটা কি এই ঝাড়ও কেটে জমি বানাবার ফন্দি আঁটছে?

পরিমল নাথ তাঁরই মত চাষী। জমিজমা তাঁর চেয়ে খুব বেশি নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘে হবে। তবু তাঁদের মধ্যে অনেক ফারাক। এই লোকটা চাষাবাদের পাশাপাশি জমি কেনাবেচা করে। ঠিক জমির ব্যাপারি তাঁকে বলা যাবে না। আসলে পরিমল নাথ অনাদরে পড়ে থাকা জমি সস্তায় কেনেন। তারপর তাকে মানুষ করে তোলেন। উঁচু-নিচু থাকলে মাটি কাটান, সমান করেন। সেই জমিতে পড়ে ছাই, গোবর এবং রাসায়নিক সার। কিছু টাকা এভাবে লগ্নির পর দেখা যায়, যেখানে এক মন ধানই ফলান যেত না, সেই জমি থেকে পরিমল নাথের হাতের ছোঁয়ায় তের-চোদ্দ মণ দিব্যি উঠছে। কী জাদুই জানে লোকটা!

এই যে একটা জমির পিছনে পরিমল নাথ এত খাটাখাটুনি করলেন, তবু সব জমি তিনি রাখেন না। জমি যে উর্বরা একথা বোঝাতে পারলে চড়া দাম ওঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বেচে দেন। পাকিস্তান-ভারত হবার পর থেকে ভাটিয়ারা দলে দলে এসে এদিকে জমি কিনছে। বাড়ি বানিয়ে বসে যাচ্ছে। ফলে গ্রাহকের অভাব হয় না।

জমি কেনাবেচা করা যেতেই পারে। কিন্তু বছর বছর পরিমল নাথ মাটি কেন কাটান? কৌতূহলবশে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম রত্নেশ্বর কার্জি। লোকটা বলে কিনা, মাটি না কাটালে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। তাছাড়া ধান কাটা শেষ হবার পর কামলাদের চাহিদা কমে যায়। মজুরি কিছু কম দিলে চলে। এজন্য মাটি তিনি শীতকালে কাটান। কম পয়সায় তাঁর কাজ উঠল, আবার কাজ পেল কামলারাও। লোকটা কিছুটা রহস্যময়।

রত্নেশ্বর কার্জি আবার এত পারেন না। সুপারি বাগান, ভিটে, বাঁশঝাড় মিলে তাঁর জমি এখন প্রায় বিঘে বাইশ। বাবার কাছ থেকে আরও কিছু জমি পেয়েছিলেন। ফলিমারিতে ছিল বিঘে দশেক। দেখাশোনার অসুবিধে। আধিয়াররা ঠিক মতো ফসলের ভাগ দেয় না। এজন্য একটু একটু করে সেই জমি তাদেরই কাছে বেচে দিয়েছেন। তারা তাঁর ঠাকুর্দার আমলের আধিয়ার। জমির ওপর তাদেরও একটা দাবি থাকেই।

সবমিলিয়ে এখন তাঁর চাষের জমি ষোল বিঘে। এক হালে হয় না। আবার দু হালের পক্ষে জমি কম। বাড়তি বদল পোষা ঝামেলা, তবু দু হালই রেখেছেন। এছাড়া রয়েছে দুধের গরু, তাদের সন্তানাদি।

রত্নেশ্বর কার্জি নিজে খুব একটা খাটতে পারেন না। তাছাড়া, গ্রামে সালিশ, এটা-ওটা লেগেই রয়েছে। এ সবে আগের মতো এখনও ডাক আসে এবং যেতে হয়।পঞ্চায়েত আছে। তবু দেওয়ানি হিসেবে আজও লোকে কিছু মান্যিগন্যি করে। এ সব কারণেই চাষবাসটা চলে গেছে মূলত তাঁর বড় ছেলে সুভাষের কাছে। সে-ই দেখে, তিনি পরামর্শ দেন।

সুভাষ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর আর ধৈর্যে কুলায়নি। বয়স ধর্মে যেমন হয়, কিছু দিন গায়ে হাওয়া

দিলে বেড়াল। ইদানীং সংসারে একটু মতি হয়েছে।

রত্নেশ্বর কার্জির ছেলে আরও দুটি-সদানন্দ এবং সুরেশ। প্রাইমারি স্কুল ছাড়াবার আগেই তাদের বইখাতার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ? এখন খায়দায় ঘুরে বেড়ায়। অথচ আরেকটু পড়াশুনা করতেই পারত। আজকাল সবাই চাকরি বাকরি চেষ্টা করে। টেনেটুনে এইট পাশ করতে পারলেই কত চাকরি।

তিন ছেলে ছাড়াও রত্নেশ্বর কার্জির তিনটি মেয়ে। স্কুলে কিছু দিন যাতায়াত করে নাম দস্তখত করা শিখেছে। ঠিকানা লিখতে পরে। এখন সংসারের কাজে মাকে একটু সাহায্য করে। বাকি সময় কাটে হেসেখেলে। অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের ভিড় বাড়িতে যে হালে লেগে থাকে, কাজকর্মের চাপ তাদের যথেষ্টই।

রত্নেশ্র কার্জির একটা সমস্যা হল, বাড়িটা শহরের কাছাকাছি বলা যায়। দূরত্ব বড় জোর মাইল তিনেক। এজন্য রাসমেলার সময় বিশেষ করে তাঁর বাড়ি অতিথিশালা হয়ে ওঠে। তাঁদের আর আগের রমরমা নেই, এটা লোকে বুঝতে চায় না। আত্মীয় - স্বজন অভ্যাসে আসে। সংসার চালানই কঠিন হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে।

কেউ না বুঝলেও রত্নেশ্বর কার্জি নিজে তো জানেন, ফলিমারির জমি গেছে এই আত্মীয়-স্বজনদের সেবায়। এটা নিঃসন্দেহে ক্ষতি। কিন্তু তোমরা আর আসবে না, এমন করে কাউকে বলা যায় না। তারা এলে খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা করতে হয় মান-সম্মান বজায় রেখে। এই যে উর্মিলাকে দেখতে আসছে, তার জন্য পাঁঠা কাটতে হবে। পাত্রপক্ষ বলে কথা। ভাল খাওয়াতেই হবে। আগে খেয়েদেয়ে তুষ্ট হবে, তারপর না মেয়ে দেখা।

সমরুকে বলা আছে। সে-ই পাঁঠা জোগাড় করবে, কেটেকুটে দিয়ে যাবে। পাঁঠাটা সে কাটে বড় ভাল। তিনি বলে রেখেছেন, সকালের দিকেই পাঁঠা নিয়ে যেন চলে আসে। সময় থাকতে কাটাকুটি শেষ করতে পারলে রান্নার সুবিধে।

অবশ্য রামপুরহাটের লোকরা দুপুরের আগে হয়ত আসতে পারবে না। আরও দেরি হতে পারে। শীতকালে নড়াচড়ার বড় সময় লাগে। তবু তাঁদের তৈরি থাকা ভাল। এজন্য একটু তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ঘাটের দিকে বেরিয়েছিলেন। আর দেখা হয়ে গেল কিনি পরিমল নাথের সঙ্গে।

মুখে খানিকটা হাসি আমদানি করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন রত্নেশ্বর কার্জি। কী বাহে, আজি বড় সাকাল সাকাল এত্তি দেখং?

লাজুক হাসেন পরিমল নাথ। বাইর হইছিলাম কামলা খোঁজাত। ভাবলাম, গজু বুড়ার বাঁশঝাড়টা একটু দেইখা যাই।

আরেকবার সেদিকে তাকান পরিমল নাথ। সতর্ক রত্নেশ্বর কার্জি নীরব। আরও কিছু শোনার অপেক্ষায়।

কাইল বুড়ার বড় পোলা গেছিল। কইল, ঝাড়টা আর রাখব না। তবে দাম খুব বেশি চায়। আমি কইলাম, দুই-চার দিন ভাইবা দেখি।

মুখের হাসিটা ধরে রাখতে পারলেন না রত্নেশ্বর কার্জি। তাহলে তিনি ঠিকই ধরেছেন। পরিমল নাথ এখন প্রাকৃতিক শোভা দেখতে আসেনি। কিন্তু লোকটা কি একদিন গোটা গ্রামই কিনে ফেলবে নাকি!

আছেন ভালই?

এই একরকম। আপনি ভাল?

চইলা যাইতাছে। আপনি কী কন, ঝাড়টা নেওন যায়? বিগা চার হাজার টাকা।

এটা আমি আর কী বলব। জমির দাম আপনি আমার চাইতে ভাল বোঝেন। আচ্ছা, চলি,

আইজ আপনের বড় মেয়েরে দেখতে আসব?

কয়েক কদম এগিয়েও থমকে দাঁড়ান রত্নেশ্বর কার্জি। এ খবরটা ও পেল কোথা থেকে! এসব পাঁচকাল করতে নেই। সম্বন্ধ নষ্ট করার লোকের অভাব হয় না। যতক্ষম না বিয়ে শেষ হচ্ছে, সতর্ক থাকতে হয়। পরিমল নাথ নিশ্চয় এ ব্যাপারে অনিষ্ট করবে না। তবু, সাবধানের মার নেই। মুখে বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কেমন করি জানলেন?

এই জানার আনন্দে স্মিতহাসিতে মুখ ভরে ওঠে পরিমল নাথের। চোখের কোণা কুঁচকে যায়। বলেন, রাস্তায় সমরুর লাগে দেখা। দেখি, পাঁঠা একটা লইয়া রওনা দিছে। ভাবলাম, এই সকাল সকাল পাঁঠা লইয়া কই যায়। জিগাইতে আপনের কথা কইল।

সমরু তাহলে বেরিয়ে পড়েছে। একটা দুশ্চিন্তা দূর হল রত্নেশ্বর কার্জির। ছেলেটি বড় খেয়ালি। ভরসা করা যায় না। তবে তাঁকে যে বিপদে ফেলছে না, এটা জেনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন রত্নেশ্বর কার্জি।

পাত্রপক্ষ সম্পর্কে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়। পান থেকে চুন খসল কি বিয়ে ভেঙে গেল। ফেরার সময় পান মুখে পুরে ঘাড় নাড়িয়ে বলবে, খবর দেব। সেই খবর আর আসবে না। নেহাত ভদ্রলোক হলে জানাবে, ছেলে এখন বিয়ে করতে চাইছে না। তাঁর এই বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এ সব কম দেখেননি।

পরিমল নাথের সঙ্গে প্রকাশ্যে তাঁর মাখামাখি যেমন নেই, শত্রুতাও অনুপস্থিত। দেখা হয়, কাজকর্মে কথা হয়। এখন মেয়ের দেখাদেখির ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় তাকেও কি দুপুরে আসতে বলা উচিৎ? প্রতিবেশী প্রভাবশালী লোকজনকে ডাকাটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। শেষপর্যন্ত সৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছেটা টপ করে গিলে ফেলেন রত্নেশ্বর কার্জি।

আপনি একটা খুব ভাল খবর দিলেন। সমরুকে নিয়া চিন্তায় ছিলাম। যাই, সব কাজ দেখাশোন কইরতে হবে। আশীর্বাদ রাখবেন, পরিমলবাবু।

মুখে আশীর্বাদ চাইলেও তার জন্য আর অপেক্ষা করেন না রত্নেশ্বর কার্জি। পা চালান বাড়ির দিকে। পরিমল নাথ তাঁর সম্পর্কে যা খুশি ভাবতে পারেন। এতে তাঁর কিছু এসে যায় না।

দুই

উর্মিলার বিয়েটা ঠিক হয়ে গেল। যতটা আশঙ্কা ছিল, সেরকম কিছুই ঘটল না। মা তাঁর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত। পছন্দ না হবার কথা নয়।

পাত্রটি পুলিশে চাকরি করে। কনস্টেবল। বছর দুই হল চাকরি পেয়েছে। দেখতে শুনতে ভাল। তারা চার ভাই, এক বোন। পাত্রই বড়। বাবা মারা গেছে অনেক দিন। খুব মদ খেত। ছেলেদের এই দোষ নেই। মা বেঁচে। তিনিই বাড়ির কর্ত্রী। এক হালের জমি আছে। একসময় জোতদার ছিল। বাড়িটা মস্ত নয়। সুপারি বাগানের পাশে বেশ বড়ই দেখায়। আর, ছেলে চাকরি যখন করে, সংসার ভরভরন্ত হতে কত দিন। চাকরি মানেই মাস ফুরলে পয়সা।

আপত্তি অবশ্য উঠেছিল উর্মিলার দিক থেকে। পাত্র পুলিশ শুনে খুব ঘাবড়ে যায়। না জানি কত রাগী মানুষ হয়। তা, সেই ভয় ভাঙিয়ে দেওয়া গেছে।

মেয়েটার বয়স তো বেশি নয়, বড় জোর ষোল। তার ভয় পাওয়ায় অবাক হবার কিছু নেই। রত্নেশ্বর কার্জি তার মাথায় হাত রেখে বুঝিয়েছেন, পুলিশ হোক বা জজ, বাড়িতে সবাই সমান। বাড়িতে কি আর সে পুলিশগিরি করবে? কিন্তু চাকরি যখন করে, হাতে কাঁচা পয়সা। মেয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকবে।

তবে হ্যাঁ, পাত্রপক্ষের দাবিটা একটু বেশি। খাট-পালঙ্ক সোনা-দানা এসব তো দিতেই হয়। সঙ্গে চাই সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি। এখানে শেষ হলে কোনও কথা ছিল না, সঙ্গে বৌভাতের খরচও যে চায়! চাকরি করে বলে কি ছেলের দর এতই বাড়ে?

রত্নেশ্বর কার্জি হিসেব করে দেখেছেন, বৌভাতের নামে যে টাকাটা চাইছে তা দিয়ে অন্তত তিনশ লোককে খাইয়ে পেট ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। এত লোক নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করবে না। আসলে বিয়ের পুরো খরচই পাত্রীর বাড়ি থেকে তুলে নেবে। পাত্রপক্ষগুলি এমনই চশমখোর হয় বটে।

এই একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি দ্বিধা করেছেন। এক সঙ্গে এত টাকা বের করা সোজা ব্যাপার নয়। তাছাড়া তাঁর বাড়িতেও দু-দশজন খাবে। শুধু খরচ আর খরচ।

কিন্তু উর্মিলার মামা হরকুমার কোনও কথাই শুনতে চাইলেন না। ওদিক থেকে এক মামা বললেন এটা দিতে হবে ওটা দিতে হবে, এদিক থেকে আরেক মামা হ্যাঁ হ্যাঁ করে গেলেন। মাতুলরা আছেই পড়ে গাড়ে কাঁঠাল ভাঙার জন্য।

ভেতরবাড়িতে ডেকে নিয়ে হরকুমারকে রত্নেশ্বর কার্জি বলেছেন তাঁর আপত্তির জায়গা। শুনল কোথায়! তার এক রা-এমন পাত্র রোজ রোজ পাওয়া যাবে না। টাকা যায় যাক, কিন্তু মেয়ের সুখের দিকটা দেখতে হবে। সবাই মিলে এমন জোর করতে শুরু করলেন যে, রাজি হয়ে গেলেন রত্নেশ্বর কার্জি। মেয়ে মানে আত্মজা। তার সুখও দেখতে হবে।

বিয়ের তারিখ পাকা। ৩ ফাল্গুন। হাতে প্রায় মাস খানেক রয়েছে। ধীরেসুস্থে তৈরি হবেন বলে এতটা সময় নেওয়া। তাছাড়া বাড়ির প্রথম বিয়ে। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ডাকতে হবে। এত লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা চাট্টিখানিক কথা নয়। তার আগে ছাপাতে হবে কার্ড। আজকাল এটা খুব চলছে। শুধু মুখে বললে চলে না, সঙ্গে একটা কার্ড ধরাতে হয়।

এরই মধ্যে বাড়িতে বিয়ের গন্ধটা বেশ বোঝা যায়। চিঁড়ের ধান শুকান হচ্ছে। ধান ভানা শুরু। মেয়েরা কুলিয়ে উঠতে না পারলেও অসুবিধে নেই। মাইল দেড় দূর নীলকুঠি হাটে রাইস মিল খুলেছে। ধান নিমেষে চাল হয়ে বেরিয়ে আসে। মানুষের কত যে বুদ্ধি!

বিয়ের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে উর্মিলার কান্নাকাটি চলছে দফায় দফায়। ছাওয়া মোর পরার ঘর যাইবে বলে যে আসে সে-ই খুঁচিয়ে দেয়, আর চলে কান্না। উর্মিলার মায়েরই চোখের জল পড়ছে বেশি। মহিলার মনটা কিছু নরম। তাছাড়া মেয়ে তার মায়েরই নেওটা। তারপর রয়েছেন তাঁর নিজের মা, বিধবা পিসি। তাঁরাও উর্মিলাকে ভালমন্দ খাওয়ানর ফাঁকে নাক মোছেন।

তা, বাড়ির একটা মানুষ চলে যাবে পরের বাড়িতে, মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর যে এখন মাথা খারাপ হবার অবস্থা।

বিয়ের সামগ্রী, অন্যান্য খরচ জোগাড় করে ফেলা যাবে। সঞ্চয় তাঁর নেই। তবে কিছু সুপারি পোঁতা আছে। বাঁশ বেচা যাবে চার-পাঁচশ, গোলার ধানও চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ বেচে দেওয়া যায়। এর সঙ্গে কিছু ধারদেনা করলে বিয়েটা একরকম তুলে দেওয়া যাবে। কিন্তু বৌভাতের নগদ টাকা মেটানর কোনও পথই তিনি দেখছেন না।

গত সপ্তাহে উর্মিলার মামাকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন। টাকার চিন্তা না করে এই বিয়ে জোড়ার দিকে তারই ঝোঁকটা ছিল বেশি। এখন নিদান দিয়ে যাক।

কিন্তু বাবু এলেন, ঠেসে দই-চিঁড়ে খেলেন, ঢের বড় বড় কথা শোনালেন, তারপর বিদায় গ্রহণ। বাড়িতে স্ত্রীর শরীর নাকি ভাল যাচ্ছে না।

রত্নেশ্বর কার্জি এত সহজে ছাড়ার পাত্র নন। পান - সুপারির বাটা এগিয়ে ধরে কথাটা পাড়েন। দেও ক্যানে কিছু টাকা, তোমার না ভাগ্নী হয়

হরকুমার গহীন জলের মাছ। আগে থেকে আঁচ করে থাকবেন। বলেন, নিজের দায়িত্ব আর বোঝেন না। খাটটা তিনি গড়িয়ে দেবেন। তার চেয়ে বেশি পারবেন না। এবার ফলন ভাল হয়নি।

হরকুমারের কাছ থেকে বিয়ের খাট পেলে কিছু সাশ্রয় অবশ্যই হবে। কিন্তু বাকি নগদ টাকা আসবে কোথা থেকে? হরকুমারের জবাব এবারও তৈরি। যাবার আগে বলেন, জমি ব্যাচে দেও ক্যানে তিন-চাইর বিঘা। তোমার কি জমি কম?

পরামর্শটা মোটের ওপর ভাল লাগেনি রত্নেশ্বর কার্জির। ফলিমারির জমি গেছে। এরপর মেয়েদের বিয়েতে যদি তিন বিঘে করে জমিও যায়, তাহলে সম্পত্তি প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। তারপর ছেলেরা একদিন পৃথগন্ন হলে কিছুই থাকবে না। তখন রত্নেশ্বর কার্জির ছেলেরা কি পরের বাড়িতে কাজ করবে, যাঁর ঠাকুর্দা ঘোড়া ছাড়া নিজের জমি দেখতে যেতেন না?

রত্নেশ্বর কার্জি খুব দমে যান। মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেপুলে যা হবার হয়েছে। এখানে তাঁর কোনও হাত নেই। কিন্তু জমি বেচাটা রোধ করতে পারেন। ছেলেরাও তো কিছু ফেলনা নয়। তেমন হলে বিয়েই দেবেন ভেঙে। শুধু পাত্র আর মেয়ের সুখ দেখলে চলবে না, আরও কিছু দেখার রয়েছে।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসে, চিন্তায় মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড় হয় রত্নেশ্বর কার্জির। আত্মীয়-স্বজন কারও কারও কাছে হাত পাতাই যায়। দান নয়, ধার চাইতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ ফিরিয়ে দেয়, যদি বলে পারব না। এভাবে বিমুখ হওয়া যে বড় লজ্জার। তিনি রত্নেশ্বর কার্জি, লোকজনের আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ান। এখন আমি নিজে বিপন্ন বলে কারও সাহায্য চাওয়া বড় অসম্মানের। তারপর যদি না নেলে, সবার চোখে খুব ছোট হয়ে যাবেন তিনি। তাঁর মত মানী লোকের পক্ষে আর যাই হোক সেটা সম্ভব নয়। অথচ টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে চলছে না। টাকার জন্য মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে রত্নেশ্বর কার্জির, এটাও তো হতে পারে না।

ভরদুপুরে পান মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রত্নেশ্বর কার্জি। সহজ সমাধান তাঁর নিজের কিছু কম জানা নেই। কিন্তু সে যে বড় হানিকর।

হাঁটতে হাঁটতে রত্নেশ্বর কার্জি চলে আসেন পুকুর পাড়ে। এর এক দিকে বাঁশঝাড়, অন্য তিন দিক খোলা। শুধু ধান খেত আর ধান খেত। দূরে দূরে বাড়ি, কলা ঝোপ।

গজু বুড়ার বাঁশঝাড় উপরে ফেলার কাজ চলছে। বাঁশ কবেই কাটা শেষ। সাত-আটজন মামলা এখন কোদাল - শাবল দিয়ে বাঁশের গুঁড়ি তুলছে। একদিন এখানে বাঁশঝাড়ের চিহ্নমাত্র থাকবে না। হয়ত এই জমিতেই মাথা তুলে দাঁড়াবে আরেক ভাটিয়ার বাড়ি।

পরিমল নাথের এই নয়া জমির কাছাকাছি তাঁরও কয়েক বিঘে জমি আছে। তেমন উর্বর নয়। একবার সেই জমির কাছে যাবার জন্য খুব একটা ছটফটানি অনুভব করলেন রত্নেশ্বর কার্জি। জমি, মানে মাটি নাকি খাঁটি চাষীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এখন তিনি গেলে সেরকম কিছু কি শুনতে পাবেন?

পরিমল নাথের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। এই অসময়ে তিনি নিশ্চয় কাজ তদারকি করছেন না। তবু পা চলে না রত্নেশ্বর কার্জির। মন্থর পায়ে তিনি আবার বাড়ির পথই ধরেন। তাঁরও কিছু দুঃখের কথা আছে। কাকে বলবেন?

ছেলেরা এখনও এতটা লায়েক নয়। স্ত্রী মহামায়া এসব নিয়ে কখনও চিন্তা করেন বলে মনে হয় না। অবশ্য তার প্রয়োজনও পড়েনি। তিনি একা হাতে চার দিক সামলে এসেছেন। তাছাড়া বাড়িতে তাঁর মুখের ওপর কথা বলে কার সাধ্য। তবু এবার যেন তিনি একার মাথায় কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কারও সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পারলে বেশ হত। কিন্তু কার কাছে যাবেন তিনি?

তিন

সুবোধ বিশ্বাসকে জমিতে দেখে থামেন রত্নেশ্বর কার্জি। দুপুর রোদে লোকটা খেতে নিড়ানি দিচ্ছে। চাষ তেমন মহার্ঘ কিছু নয়, ডাঁটা। লোকে যখন জমিতে ভাল করে লাঙলই নামাতে পারেনি, এ দিব্যি কচি কচি ডাঁটা চারা তুলে ফেলেছে। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে এসব বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠবে।

সুবোধ বিশ্বাস লোকটা এমনই। প্রচলিত মোটা দাগের চাষ-ধান-পাটে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। তাঁর ঝোঁক এটা-ওটার দিকে। আলু-মুলো-বেগুন-উচ্ছে-পেঁয়াজ-রসুন-লাউ-কুমড়ো- কোন খুচরো জিনিসটি নেই তাঁর সামান্য জমিতে। প্রায় রোজ সকালে কিছু না কিছু ডালিতে চাপিয়ে রওনা দেন বাজারের দিকে। আমদানি যে ভালই হয় তা বোঝা যায় উন্নতির বহর দেখে। প্রতি বছর জমি বাড়ছে তাঁর। গত অগ্রহায়ণে মেয়ের বিয়ে দিলেন। সবটাই নিশ্চয় পাকিস্তান থেকে আসে না।

একদিন কৌতূহল সামলাতে না পেরে চেপে ধরেছিলেন সুবোধ বিশ্বাসকে। পাকিস্তানে কি তাদের অনেক সম্পত্তি, ওই লোকে ও'দেশে থেকে এসেই যেমন বলে - গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু নিয়ে সম্পন্ন ছিলেন তাঁরা? কিপ্টের মতো হলেও খানিক খুব হাসেন সুবোধ বিশ্বাস। অনেকে সীমান্ত পার হয়েই মেলা বারফট্টাই করে ঠিক, আদপে বেশিরভাগই ও'দেশে সাধারণ জীবনযাপন করেছে। তাঁর নিজেরই এমন কী ছিল? বিঘে চারেক জমি। তাতে অর্ধেক বছরের খোরাকি উঠত না। পরের জমি ভাগে চাষে কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করতেন।

এখনই সুবোধ বিশ্বাস আর কোথায় তেমন সুখে। এ দেশে আসার পর দিনরাত খেটে জমিজিরেত কিছু বাড়ান গেছে। ছেলে-মেয়ে কিছু কম - দুটি। তাই রক্ষা। মেয়েটিকে পাত্রস্থ করতে হবে বলে সেই কবে দেশে দু-দশ টাকা করে জমিয়েছেন, গহনাপত্র কিনে রেখেছেন। নইলে এই আক্রামন্দার বাজারে মেয়ে পার করতে গিয়ে ফতুর হয়ে যেতেন।

হাতের নিড়ানি থামিয়ে রয়েসয়ে কথা বলেন সুবোধ বিশ্বাস। আবহাওয়া, ফলনের সম্ভাবনা এইসব। গ্রামের একজন মানী লোক যে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে, এটা যেন মনেই ছিল না তাঁর।

ইস, দেখেন দেখি আমার কাণ্ড। চলেন, বাড়িতে যাবেন। এইভাবে কি আর কথা হয়?

না, রত্নেশ্বর কার্জির একটুও বসার ইচ্ছে নেই। সুবোধ বিশ্বাসের পাশে নিজেকে বড় আয়সী মনে হয় তার। এ ব্যাটা দিব্যি একটা বিয়ে তুলে দিল, অথচ তিনি পারছেন না। অবশ্য সুবোধ বিশ্বাসের পক্ষে যা করা সম্ভব, সেটা তিনি পারবেন না। সারা দিন জমিতে পড়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন। এত বড় হয়ে অবধি ও কাজ করেননি। তাছাড়া তাঁর পক্ষে সব মানায় না। তবে হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ের জন্য আগে থেকে তৈরি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সংসারের পিছনে কিছু জমি পর্যন্ত চলে গেছে যার, সে কী করে সঞ্চয়ের মতো বিলাসিতা করে?

মেয়ের বিয়ে ঠিক করে খুব বিপদে পড়েছেন রত্নেশ্বর কার্জি। এ থেকে উদ্ধার কীভাবে, ও বিশ্বাস মশাই, মাথায় যে কুলায় না!

যদি কিছু মনে না করেন, লাগলে আমি কিছু হাওলাত দিতে পারি? সুবিধামতো আপনি আমারে ফেরত দিবেন।

আপনি দিবেন!

হ্যাঁ, দেবেন সুবোধ বিশ্বাস। উর্মিলা কি তাঁরও মেয়ে নয়?

কত দিতে পারবেন আপনি?

এই ধরেন হাজারখানেক।

চোখে জল এসে যায় রত্নেশ্বর কার্জির। সত্যিই, সুবোধ বিশ্বাস খুব ভাল লোক। আজকাল কে এভাবে অন্যের জন্য জলে নামে। কিন্তু হাজারের যে কিছু হবে না রত্নেশ্বর কার্জির। তাঁর চাই পাঁচ হাজার টাকা।

এত টাকা তো আমার নাই!

জানি, বিশ্বাস, জানি। এই জন্যে বলি নাই। এখন যা অবস্থা বিয়া না ভাঙলে জমি বেচতে লাগে।

না, না, জমি বেচবেন না। সুবোধ বিশ্বাস কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। বলেন, জমি বেচা খুব খারাপ।

কিন্তু উপায় যে নাই?

না পারলে বন্দক দেন। কিন্তু বেচাত যাইয়েন না। বন্দক দিলে টাকা জোগাড় হইলে নিজের জমি আবার ফেরত পাইবেন। বেচলে আর ঘুরান যায় না।

পরামর্শটা পছন্দ হয় রত্নেশ্বর কার্জির। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। এখন বন্ধকের জন্য কাকে ধরবেন তিনি?

একটু ভাবেন সুবোধ বিশ্বাস। বলেন, আমার শালা একটা পাকিস্তান থাইকা আসছে। স্যায় কিনার মত জমিই খোঁজে। লগে কিছু টাকা বোধ হয় আছে। তারে একবার জিগাইয়া দেখতে পারি।

একটা আশার আলো দেখেন রত্নেশ্বর কার্জি। তাহলে তাই হোক। পরে তিনি খবর নেবেন। সুবোধ বিশ্বাস বলেন, তার দরকার নাই। তিনি নিজেই সন্ধ্যার দিকে রত্নেশ্বর কার্জির বাড়ি যাবেন। এটুকু করতে পারলে তাঁর ভালই লাগবে।

চার

কপাল ভাল বলতে হবে রত্নেশ্বর কার্জির। গোড়াতে গাঁইগুই করলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে সুবোধ। বিশ্বাসের শ্যালক মন্মাথ। কিন্তু হাতে টাকা কিছু কম। পুরোটাই দিতে পারবে সে। তবে এজন্য একবার ওপারে যেতে হবে। সব ব্যবস্থা করা আছে। শুধু দিন সাতেক সময় প্রয়োজন।

এতে অবশ্য আপত্তি নেই রত্নেশ্বর কার্জির। উর্মিলার বিয়ে ৩ ফাল্গুন। মন্মথ ১ ফাল্গুনের মধ্যে আসতে পারলেই চলে। এই টাকা তো আর তিনি খরচ করবেন না, বিয়ে আসরে সোজা তুলে দেবেন পাত্রপক্ষের হাতে।

তার চিন্তার জায়গা অন্যত্র। টাকা নিয়ে ঠিক সময়ে মন্মথ পৌঁছাতে না পারলে কেলেঙ্কারি হবে। তবে সুবোধ বিশ্বাস তাঁকে আশ্বস্থ করেন। দালাল ধরা আছে। এরা থাকতে এপার ওপার যাতায়াত করা আজকাল জলভাত। কত লোক যায় আসে। কাক-পক্ষীও টের পায় না। তাছাড়া মন্মথ চালক-চতুর। ঠিক চলে আসবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রত্নেশ্বর কার্জি। এ যাত্রায় জমিতে তাহলে হাত পড়ছে না। অবশ্য বন্ধকও একটা ক্ষতি। চার

বিঘে জমি বন্দক দিতে হচ্ছে। আর কিছু কমে যাবে। তবে ছেলেরা আরেকটু পরিশ্রমী হলে, তিনি নিজের চাষের কাজে একটু লাগলে এটা দু-তিন বছরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। দু বছর পরপর বাঁশ বেচা যায়। এটাও একটা ভরসার দিক।

এতদিনে বিয়ের আয়োজন পরিপূর্ণভাবে মন দেন তিনি।

পাঁচ

বিয়ের তিন - চার দিন আগে থেকে একটু একটু করে বাড়িতে আসতে থাকে দানসামগ্রী, নানা জিনিসপত্র। ধীরে ধীরে ভিড় জমে আত্মীয়-স্বজনদের। মেয়ের বিয়ে সবসময় কষ্টের। ভাবী বিচ্ছেদের অনিবার্যতায় মনটা তার হয়ে থাকে। তবু উৎসবের পরিবেশটুকু ভালই লাগে রত্নেশ্বর কার্জির। সবাইকে যদি সারা বছর ধরে এমন হাসিঘুশি দেখা যেত!

কিন্তু তাঁর নিজের খুশি উবে যায় ১ তারিখের মধ্যে মন্মথ আসতে না পারায়। চিন্তায় পড়ে সুবোধ বিশ্বাসও। এমন তো হবার কথা নয়। ২ তরিখ সকাল সকাল তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েন গীতালদহের উদ্দেশে। গীতালদহ এ পারের বর্ডার। মন্মথের দুই দালালের একজন গীতালদহের। অন্যজন থাকে ওপারের লালমণির হাটে।

তাঁর এই অভিযান একেবারে বৃথা যায় না। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসেন। সঙ্গে মন্মথ। রত্নেশ্বর কার্জি দ্বিতীয়বার খোঁজ নিতে গিয়ে তাঁদের পেয়ে যান। ভগ্নিপতি-শ্যালক মিলে কুপির আলোয় ভাত খাচ্ছেন। পাশে ঘোমটা কিছু আলগা করে বসা সুবোধ বিশ্বাসের স্ত্রী।

রত্নেশ্বর কার্জি গলা খাঁকারি দিলেন আধখাওয়া ভাতের থালা রেখে উঠে আসেন সুবোধ বিশ্বাস। হাত দুটি জোড় করে বলেন, দেওয়ানি, ক্ষমা করবেন। কথা রাখতে পারলাম না।

পারলেন না! কেনে, কী হইছে?

কেঁপে ওঠেন রত্নেশ্বর কার্জি। খুব রুক্ষ শোনায় তাঁর গলা।

সুবোধ বিশ্বাস নুয়ে পড়ে শোনান না পারার কাহিনী। টাকার ব্যবস্থা ঠিকই করেছে মন্মথ। এখানে তাঁর ভূমিকায় কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু যা ঘটার নয় - সীমান্তে ঠিক এবারই ধরা পড়ে যায় টাকাপয়সা সহ। অনেক কষ্টে তাকে ছাড়িয়ে আনা গেছে। কিন্তু ওপারের পুলিশ টাকা রেখে দিয়েছে। সব টাকা। এখন রত্নেশ্বর কার্জি তাঁদের যে শাস্তি দেবেন, দিতে পারেন। তাঁরা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আর যদি পারেন, ক্ষমা করে দেবেন।

রত্নেশ্বর কার্জি সবটা শোনেন না। শোনার প্রয়োজনও নেই। মাথা ঘুরতে থাকে তাঁর। নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে আসেন তিনি। বাড়ি ফেরেন অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে।

মহামায়া তখনও জেগে। ঘর-বার করছেন। তাঁকে দেখে বলে ওঠেন-খপর পাইলেন? রত্নেশ্বর কার্জি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেন না। আসলে একদম সময় নেই তাঁর। কাথের সিন্দুক থেকে বের করে আনেন জমির দলিলপত্র। তারপর বাজারের থলেতে পুরে বেরিয়ে পড়েন। পেছন পেছন ছুটে আসেন মহামায়া।

কোটে যান তোমরা? কথাও ক্যানে না কন!

রত্নেশ্বর কার্জি আর্তনাদ শুনে একবার থমকে দাঁড়ান। পিছন ফিরে তাকন স্ত্রীর দিকে। লণ্ঠনের হলদে আলোয় সেই তীব্র চোখ যেন প্রশ্ন হারিয়ে যায় মহামায়ার। বলেন, কোটে যাবেন, যাও। বেশি দেরি না কইরবেন।

চলতে শুরু করেন রত্নেশ্বর কার্জি। রাত কি খুব বেশি হয়েছে? বাড়িতে দেওয়াল ঘড়ি একটা আছে, দেখে নিলে ভাল হত। কে জানে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন পরিমল নাথ। তবে তাঁকে ডেকে তুলবেন তিনি। এক নিঃশ্বাসে তিন-চার বিঘে জমি কেনার সামর্থ এ তল্লাটে আর কারও নেই। শুধু দামে হয়ত একটু ঠকতে হবে, এই যা।